এবং অভিজাতবৃন্দ

❖ জীবনযাত্রার মান ঃ

মুঘল আমলে ভারতের জনসংখ্যার ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করতেন। শহর ও গ্রামে জীবনযাত্রার মান স্বাভাবিক কারণেই স্বতন্ত্র ছিল। শহরে মূলত রাজপরিবারের সদস্য, অভিজাতবৃন্দ, বণিক, ব্যবসায়ী, বিভিন্ন স্তরের সরকারী কর্মচারী, সেনা বাহিনীর কিছু অংশ স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। পেশা বা বৃত্তি নির্ভর এই সকল মানুষ সুখী ও স্বচ্ছল ছিল বলেই জানা যায়। পর্যটক বার্নিয়ার সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ের যে সমাজ চিত্র দিয়েছেন তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে, সমকালীন ভারতীয় সমাজে দুটি শ্রেণীর (আর্থিকভাবে) অস্তিত্ব ছিল—ধনী ও দরিদ্র। মধ্যবর্তী স্তরে কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। এদের জীবনযাপন পদ্ধতির একদিকে ছিল সুখ, স্বচ্ছলতা ও আড়ম্বর, অন্যদিকে ছিল ক্ষুধা নিবারণের বিরামহীন সংগ্রাম। মোরল্যান্ড প্রায় অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। মোরল্যান্ড এর মতে, বাংলাদেশে একটা মধ্যবর্তী শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল। তবে অবশিষ্ট ভারতে প্রবল ধনী ও দরিদ্র ছাড়া কিছু ছিল না।

শহর এবং গ্রামের জীবনযাত্রার মান অনুরূপ না-হলেও, বার্নিয়ার এর বক্তব্য সম্পূর্ণ সঠিক নয়। আসলে তিনি ইউরোপীয় সমাজে শাসকশ্রেণীর চরিত্রের নিরিখে ভারতের জীবনযাত্রাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মধ্যবর্তী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখতে পাননি। সতীশচন্দ্র, ইরফান হাবিব প্রমুখ ষোল-আঠারো শতকে ভারতের শহরগুলিতে উদীয়মান মধ্যবিত্ত (rising middle class)-দের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন। শহরাঞ্চলে মুঘল প্রশাসনের সাথে যুক্ত সাধারণ প্রশাসন ও রাজস্ব কর্মচারীরা বাস করতেন। বহুসংখ্যক করণিক রাজকাজে নিয়োজিত ছিলেন। রাজস্ব কর্মচারীদের আবস্থা ছিল বেশী স্বচ্ছল। আমিল, কারকুন প্রমুখ কর্মীবর্গ রাজস্ব আত্মসাৎ করে বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। ক্ষেত্রী ও জৈন সম্প্রদায় থেকে নিযুক্ত রাজস্ব কর্মীরা সরকারী কাজের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য থেকেও মুনাফা অর্জন করতেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ অর্থ ঋণ দিয়ে সুদ বাবদ অর্থ লাভ করতেন। জাহানাবাদের আমিন ও ফৌজদার আবদুস সামাদ খাঁ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলে জাহানাবাদে নিজেই একটা শহর পত্তন করে বসবাস শুরু করেছিলেন। এছাড়া হাকিম-বৈদ্য, ডাক্তার, সঙ্গীত শিল্পী, পুঁথি নকলকারী, চিত্রশিল্পী, সাহিত্যিক, ধর্মজ্ঞ পণ্ডিত প্রমুখ শহরে শিক্ষিত ... শ্রেণী হিসেবে যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন

শহরে মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলির মধ্যে উচ্চ-রাজ কর্মচারীকে বাদ দিলে রাজস্ব কর্মী এবং ডাক্তারদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল বেশী।



গ্রাম জীবনের মান সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সমকালীন কাব্য-সাহিত্যে গ্রাম জীবনের বহু বর্ণনা আছে, যেখান থেকে গ্রামের জীবনযাপনের মান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব। মুকুন্দরাম (ষষ্ঠ শতক), কবি ভারতচন্দ্র (আঠারো শতক) প্রমুখের রচনা এক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য করে। বাবরের আত্মজীবনী বা পেলসার্ট প্রমুখ পর্যটকের রচনাতেও গ্রাম জীবনের বহু ছবি পাওয়া যায়। গ্রামে সকল অধিবাসীর বা সকল গ্রামের অবস্থা একই বন্ধনীতে উল্লেখ করা যায় না। গ্রামবাসীদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি উৎপাদন। কিন্তু উৎপাদনকারী শ্রমিক এবং মধ্যসত্ত্বভোগকারী ভূস্বামীর আর্থিক অবস্থার ফারাক ছিল স্বাভাবিক। কৃষক বা ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের জীবন যাত্রার মান ছিল খুবই সাধারণ, কষ্টসাধ্য। অধিকাংশের বাস ছিল পর্ণকুটিরে। ছোট ছোট এক কক্ষযুক্ত ঘরে কেবল প্রবেশের একটা পথ ছিল। কোন জানালা ছিল না। অনুচ্চ, আলো-বাতাসহীন ঘরেই গ্রামীণ জনসংখ্যার আশি শতাংশ বাস করতেন। জেসুইট পাদ্রীদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সপ্তদশ শতকে সোনারগাঁওতে বন্য পশুর (শেয়াল, নেকড়ে ইত্যাদি) হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোন কোন ঘরে দরজা লাগানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। পাদ্রী মানরিকের মতে, ছোট হলেও ঘরগুলি ছিল পরিষ্কার। উঠোন ও দেয়ালে গোবর-মাটির মিশ্রণযুক্ত প্রলেপ থাকত। গুজরাটে খড়ের ছাউনির বদলে মাটির টালির ব্যবহার শুরু হয়েছিল। অবশ্য এঁরা ছিলেন তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছল এবং কৃষি-ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে আয় করতেন। কাফি খাঁ, ভীম সেন প্রমুখের লেখা থেকে স্পষ্ট যে, গ্রামে বহু জমি অনাবাদী পড়ে থাকত। কিন্তু সাধারণ কৃষি-শ্রমিকরা সেগুলিতে স্বাধীনভাবে চাষাবাদ করতে পারত না। কারণ তাদের কাছে প্রয়োজনীয় কৃষি সরঞ্জাম, পশু, বীজ ইত্যাদি থাকত না। তাছাড়া মুঘল আমলে 'হাঁকোয়া' আইন ও 'গৈর জমাই' আইন অনুসারে কোন কৃষক নিজ গ্রাম ও জমি ছেড়ে নতুন গ্রামে বা নতুন জমিতে চাষাবাদ করতে পারত না।

সাম্প্রতিক গবেষণায় বলা হয় যে, গ্রামাঞ্চলেও শহরের মত কিছু স্বচ্ছল পরিবারের অস্তিত্ব ছিল এবং কিছু পরিবার মুঘল আমলে অবস্থার পরিবর্তন করে দারিদ্র্য থেকে স্বচ্ছলতার দিকে এগোতে সচেষ্ট ছিল। কিছু মানুষ ঋণ নিয়ে অনাবাদী জমিতে চাষাবাদে নিয়োজিত হয়েছিলেন। দক্ষ-কারিগর বা ওস্তাদ-কারিগররা উদ্বৃত্ত অর্থ (জমানো) লগ্নী করে ব্যবসা বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন। মুকদ্দম, চৌধুরী প্রমুখ গ্রামীণ রাজস্ব সংগ্রাহকদের যথেষ্ট সম্পদ ও প্রভাব ছিল। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে অনেকেই বিত্ত ও সামাজিক কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। মুকুন্দরামের রচনা থেকে দামুন্যা গ্রামে ডিহিদার মামুদ শরীফের বিত্ত-বৈভবের কাহিনী জানা যায়। গ্রাম্য-মুখিয়া গোপীনাথ নন্দীও জমিদারের সমতুল্য প্রভাব প্রতিপত্তি ভোগ করতেন বলে জানা যায়।

গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীর পোষাক পরিচ্ছদ ছিল সাধারণ। বাবর উল্লেখ করেছেন যে কৃষক ও নিম্ন আয়ের লোকেরা কোমরে একটা ছোট কাপড় জড়িয়ে রাখতেন এবং মহিলারা শাড়ী পরতেন। আবুল ফজলও গ্রামীণ পুরুষের পোষাক হিসেবে লুঙ্গি জাতীয় বস্ত্রের কথা লিখেছেন। মোরল্যান্ড বলেছেন যে, মেয়েরা শাড়ির সঙ্গে কোন জামা পরতেন না। সাধারণ মানুষ জুতো ছাড়াই খালি পায়ে চলাচল করতে অভ্যস্ত ছিলেন। এই বিবরণ অনেকটাই সত্য, তবে সর্বাংশে সত্য নয়। সমকালীন সাহিত্য, চিত্রকলায় গ্রামের মানুষের পোষাক ও খাদ্যাভ্যাসে সচ্ছলতার ছবি পাওয়া যায়। যেমন, সমকালীন হিন্দি কবি সুরদাস আগ্রা অঞ্চলে গোয়ালিনীদের বর্ণময় চোলি ও আঙ্গিরা পরিধানের কথা বলেছেন। পর্যটক র‍্যাফল ফিন ও জেসুইট পাদ্রীদের বর্ণনাতে মহিলাদের

সোনা, রূপা, তামা ইত্যাদি ধাতুর অলংকার পরিধানের কথা জানা যায়। খাদ্যের ক্ষেত্রে চাল, জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি ছিল প্রধান, তবে দুধের প্রাচুর্য ছিল যা সাধারণ মানুষও গ্রহণ করতেন। কবি ভারতচন্দ্র একজন সাধারণ মায়ের প্রার্থনা হিসেবে লিখেছেন যে, তাঁর সন্তান যেন দুধে-ভাতে থাকতে পারে। তবে দুধ, ঘি পেলেও, কৃষক পরিবারগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় লবণ সংগ্রহ করা বেশ কষ্টকর হত। কারণ লবণের মূল্য ছিল বেশী এবং সরবরাহ ছিল কম। মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে দুধ, চিনির সহজলভ্যতা এবং পায়েস ও অন্যান্য মিষ্টান্ন প্রাচুর্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

গ্রামজীবনে অবসর বিনোদনের সুযোগ বেশী ছিল না। তবে সারা বছর ব্যাপী নানা ধরনের পার্বণ পালিত হত। পার্বণগুলিতে সপরিবারে আনন্দে মেতে ওঠার সুযোগ ছিল। টুসু, ভাদু ইত্যাদি পার্বণগুলিতে এক বা একাধিক গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে আনন্দে অংশ নিতেন। বহুসংখ্যক মানুষের মিলন ক্ষেত্র ছিল মেলা-উৎসব। মেলা উপলক্ষে দূর-দূরান্ত থেকে সৌখিন পণ্যের পসরা নিয়ে ব্যাপারীরা সমবেত হতেন। স্থানীয় শিল্পী-কারিগররাও মেলাতে পসরা সাজিয়ে বসতেন। আধুনিক হাট বা বাজারের মত মেলাগুলি পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। গ্রামের সকল স্তরের মানুষ নিজ নিজ সাধ্য অনুসারে মেলা উৎসবে আনন্দ ভোগ করতে চাইতেন।

আনন্দের মাঝে বিষাদের ছিল নিত্য আনাগোনা। ষোল থেকে আঠারো শতকের মধ্যে অনাবৃষ্টি আকাল, দুর্ভিক্ষ বারংবার জনজীবনকে অনিশ্চিত করে তুলেছিল। ১৬৩০-৩২ খ্রিস্টাব্দে গুজরাট ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল। ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বিহার ও উত্তর বাংলার অসংখ্য গ্রাম শূন্য হয়ে গিয়েছিল। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের 'মন্বন্তর' বাংলার গ্রামকে গ্রাম জনশূন্য মরুভূমিতে পরিণত করেছিল। এ ছাড়াও অনাবৃষ্টি জনিত কারণে ছোট ছোট আকাল প্রায়ই ঘটত। মুঘল প্রশাসন কর মুকুব করে দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকার মানুষকে বাঁচাতে চেষ্টা করতেন। বিনামূল্যে খাদ্য-বিতরণের উদ্যোগও সরকারী স্তরে নেওয়া হত। যদিও প্রত্যন্ত গ্রামের দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের কাছে তা যথেষ্ট ছিল না। তাই গ্রামাঞ্চলে মৃত্যুর হার ছিল অস্বাভাবিক রূপে বেশী